সাঁওতাল বিদ্রোহের স্থান কোন ইতিহাসে?

ফারুক ওয়াসিফ

ভারতবর্ষ তথা বাংলা ভূখণ্ডের ইতিহাসে সাঁওতাল গণবিদ্রোহ বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী অনেক কারণেই। যা ছিল এককালে ইংরেজের ভারত শাসনের দিনপঞ্জির অংশ, বর্তমানকালে তার জায়গা ব্রিটিশবিরোধী গণসংগ্রামের ইতিহাসে। মূলধারার দরবারি ইতিহাস এবং পাঠ্যপুস্তকের বর্ণনায় তা এখন স্বাধীনতা সংগ্রামের অংশ। সাঁওতাল জাতির জাতীয় সংগ্রামের প্রতি সহানুভূতিশীল ঐতিহাসিকদের কাছে এই বিদ্রোহ দেশি সামন্তবাদ এবং বিদেশি সাম্রাজ্যবাদের শোষণ-নির্যাতনের বিরুদ্ধে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত এবং সাহসী আঘাত।

সাঁওতাল বিদ্রোহের ওপর চমৎকার এবং বস্তুনিষ্ঠ আলোচনার জন্য ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে বিশেষ গুরুত্বের দাবিদার। তাঁর কাছে এ বিদ্রোহের তাৎপর্য হলো: *'অর্থনৈতিক অধিকার অর্জনের জন্য অন্যায়ের প্রতিবাদ করে সাঁওতাল বিদ্রোহীরা সেদিন যে সংগ্রামী ভূমিকা নিয়েছিল এবং সর্বস্তরের শ্রমজীবী মানুষকে ইংরাজ রাজের সর্বগ্রাসী শোষণব্যবস্থা থেকে মুক্ত করার জন্য যে প্রতিরোধ তারা গড়ে তুলেছিল..., (তাদের) অতুলনীয় দেশপ্রেম ও আত্মত্যাগ পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন অঞ্চলের সাধারণ মানুষের মনে স্বাধীনতাস্পৃহাকে তীব্রভাবে জাগিয়ে দিয়েছিল। (পরিণতিতে) দেখা দিয়েছিল ভারতব্যাপী ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন। তাই আজ সাঁওতাল বিদ্রোহের ঐতিহাসিক গুরুত্ব সর্বজনস্বীকৃত।'(সাঁওতাল গণসংগ্রামের ইতিহাস, ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে, বিজয়ন, কলকাতা ১৯৭৬)*

ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে পেশাদার ঐতিহাসিক নন। তিনি 'শিক্ষিত' ও 'প্রগতিশীল' মন নিয়ে ইতিহাসের ধারাবাহিকতার মধ্যে সাঁওতাল বিদ্রোহের জন্য একটুকরা জমি আদায় করতে চেয়েছেন। এভাবে ইতিহাসে স্থান করে দিলেই যেন তারা মূলধারার ইতিহাসে উল্লেখ হবার যোগ্যতা অর্জন করে। কিন্তু এই ইতিহাস ও তার বরাদ্দ করা স্থান সাঁওতাল বিদ্রোহ 'নিজে যেমন' সেভাবে তাকে বুঝতে ও স্বীকার করতে অপারগ, বরং ভবিষ্যতে যে স্বাধীনতা সংগ্রাম হবে, এবং তার জেরে ভারতীয় মধ্যবিত্ত ও জাতীয় বুর্জোয়ার জোট ব্রিটিশের থেকে আন্দোলনের মজুরি বাবদ যে ভারতীয় ভূখণ্ড ও তার জন-জাতির ওপর মালিকানার দলিলসহ একটা আস্ত তৈরি রাষ্ট্র পাবে, এই টেলিওলজির (পরমকারণবাদ-পৃথিবীর সকল কিছুই কোনো পরম উদ্দেশ্যের দিকে ধাবিত, এমন চিন্তা। ইতিহাসের কোনো ঘটনাকে ভবিষ্যতের কোনো পরিণতির সঙ্গে অনিবার্যভাবে যুক্ত করার পদ্ধতি) ওপর নির্ভরশীল। কার্য-কারণ সম্পর্কে গাঁথা ইতিহাস এখানে ফল দিয়ে কারণের বৈধতা তৈরি করছে। বিদ্রোহ এখানে কার্য, কারণ অর্থনৈতিক শোষণ এবং এর ফলে স্বাধীনতাপ্রাপ্তি ঘটে। কিন্তু বৃহত্তর স্বাধীনতা সংগ্রাম যদি জয়যুক্ত না হতো, বা আদৌ সেরকম কিছু না থাকতো, তবে সাঁওতালদের 'আত্মত্যাগের' স্থান কোথায় হতো? তখন অ-সাঁওতাল ঐতিহাসিকের তরফে তাকে মহিমান্বিত করবার যুক্তি কী হতো? কিংবা স্বাধীন ভারত ও বাংলাদেশে যখন মণিপুরি বা চাকমা বিদ্রোহ যখন ঘটে, তখন কি সেসবকেও এরকম করে স্বাধীনতা সংগ্রামের মাইলফলকের তালিকায় স্থান দেওয়ার গরিমা দেওয়া হয়?

ভারতীয় বুর্জোয়া বা বাঙালি বর্ণহিন্দু মধ্যবিত্ত ব্যবসায়ী, চাকুরে, বুদ্ধিজীবীদের স্বাধীনতা সংগ্রামের মধ্যে যোগসূত্র নির্ঘাত পাওয়া যাবে, কিন্তু উভয়ের স্বাধীনতা সংগ্রাম কি এক চরিত্রের? একজনের স্বাধীনতা অন্যজনের জীবনে কি একই অর্থ বহন করে আনে? নাকি তা পরস্পরকে আধিপত্য ও শোষণ-বঞ্চনার নতুন এক সমীকরণের মধ্যে টেনে আনে? এ প্রশ্নের গোড়ার সঙ্গেই জড়িত রয়েছে আরেকটা প্রশ্ন। তা যদি হয়, তবে স্বাধীনতা সংগ্রামের পথপরিক্রমা আর বিদ্রোহের নিজস্ব আচার-ব্যবহার কোথাও কোথাও মিলতে পারে, কিন্তু তাদের গড়ন ও ভেতরের শাঁস এক স্বভাবের নয়। বিদ্রোহ ও আধিপত্যের ক্রিয়াকর্মের গণিত তাই দুয়ে-দুয়ে চার মেলানোর ব্যাপার নয়। যেমন নয় উচ্চবর্গের জাতীয়বাদকে ইতিহাসের সকল নিম্নবর্গীয় কৃষক এবং জন-জাতির লড়াইয়ের অবধারিত মোক্ষম আদর্শ বলে মেনে নেওয়া। এই দেখাটা ওপর থেকে। দেখনদার এখানে আগে থেকেই জানেন কিসে কী হয়। পর্যাপ্ত পরিমাণ তথ্য পাবার আগেই তাঁর জানা থাকে যে, সেখানে (সাঁওতাল পরগনা, তিতুমীরের নারকেলবেড়িয়া বা আরো বড় পরিসরে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ইত্যাদি) দেশপ্রেমিক জনগণ গোটা জাতির হয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামে জান বাজি করছে। ব্যাখ্যাকারীর কাজ হলো শুধু খবর ও ঘটনা জোগাড় করে ছক অনুযায়ী বসিয়ে দেওয়া। কিন্তু তাতেই সকল সময় বিদ্রোহী-বাস্তবতার যথার্থ চিত্রণ হয় না। একই লড়াই তাই কারো কাছে জাতীয় সংগ্রাম, কারো কাছে শ্রেণিসংগ্রাম, কারো কাছে ধর্মযুদ্ধ বা জিহাদ। হয়তো এদের বাস্তব অন্তঃসারের জায়গায় একটা গড় ব্যাপার থাকে, কিন্তু সেটাই বুঝবার শেষকথা নয়, সেটা বরং গোড়ার কথা। সে কারণে আমরাও

তবে স্বাধীনতা সংগ্রামের পথপরিক্রমা আর বিদ্রোহের নিজস্ব আচার-ব্যবহার কোথাও কোথাও মিলতে পারে, কিন্তু তাদের গড়ন ও ভেতরের শাঁস এক স্বভাবের নয়। বিদ্রোহ ও আধিপত্যের ক্রিয়াকর্মের গণিত তাই দুয়ে-দুয়ে চার মেলানোর ব্যাপার নয়। যেমন নয় উচ্চবর্গের জাতীয়বাদকে ইতিহাসের সকল নিম্নবর্গীয় কৃষক এবং জন-জাতির লড়াইয়ের অবধারিত মোক্ষম আদর্শ বলে মেনে নেওয়া।

কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোর এই সারকথা থেকে আমাদের যাত্রা শুরু করতে পারি যে, সমাজের এক অংশের দ্বারা অপর অংশের শোষণের বিরুদ্ধের লড়াই 'অতীত যুগের সামাজিক চেতনায় যত বিভিন্নতা ও বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়েই প্রকাশ পাক না কেন, তা কয়েকটি নির্দিষ্ট রূপ বা সাধারণ ধারণার মধ্যেই আবদ্ধ থেকেছে'।(কার্ল মার্কস ও এঙ্গেলস, কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহার, প্রগতি প্রকাশন)

যখন বিদ্রোহ ঘটে তখন নিশ্চয়ই তার একটা লক্ষ্য থাকে, থাকে চিহ্নিত-আধাচিহ্নিত শত্রু-মিত্র। কিন্তু আধুনিক চৈতন্য ও ইতিহাসবোধের বাইরে যাদের অবস্থান, সেই বহুল কথিত 'আদিম' অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে যাদের জীবন, তাদের ক্রিয়াকর্মকে কি আমরা এক পাতে বসিয়ে পরিবেশন করব! যদি করি, তো প্রমাণ করতে হবে যে, উভয়ের মূল ভিত্তিটি এক, এবং তা স্থান-কাল-সমাজ-অর্থনীতির বদল সত্ত্বেও চির অটুট। কিন্তু ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা এসে বাদ সাধবে, এবং নতুন নতুন অনেক অভিজ্ঞতা ও শর্ত দিয়ে এই ধারণাকে খণ্ডন করবে। যেমন– সাঁওতাল জাতির জাতীয় বিদ্রোহ এবং একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের অন্তঃসারে অপরের গোলামি থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা থাকলেও সেই মুক্তি কিন্তু একই বৈশিষ্ট্য এবং এক পন্থা নির্দেশ করে। যেমন– ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক কর্তৃত্বের ছত্রচ্ছায়ায় বাঙালি সামন্ত-অভিজাতের বিরুদ্ধে সাঁওতালি বিদ্রোহ সামন্তপ্রভু-মহাজন ও বেনিয়াবিরোধী আদল গ্রহণ করেছিল, অন্যদিকে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালিত হয়েছিল পাকিস্তানের বড় বুর্জোয়া এবং সামরিক-বেসামরিক আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে। এবং পরিণতিতে তা সাময়িকভাবে বিদেশি শোষণ থেকে বেরিয়ে এলেও নিজ জাতির হাতে নিজ জাতির দলন ও শোষণের অবসানকে লক্ষ্য হিসেবে নিশানা করতে পারেনি। অর্থাৎ শ্রেণি আধিপত্য অবসানের বিষয়টি এর নেতৃত্বের চিন্তার মধ্যে সচেতনভাবেই ছিল না। সে কারণেই জনগণের নানান অংশের মধ্যে এ বিষয়ে পরিষ্কার বা আবছা আকাঙ্ক্ষা থাকলেও তা পরাস্ত হয়েছে। অপরদিকে বিদ্রোহের আগে বা পরে সাঁওতালদের কাছে জাতির ভেতরের লড়াইয়ের কোনো প্রাসঙ্গিকতা ছিল না। কারণ তাদের মধ্যে তখনো সে রকম কোনো বিভাজনের জন্ম হয়নি। তারা লড়েছিল একজোট হয়ে, গোটা কৌম এক ও অভিন্ন শরীর হয়ে। প্রাক-রাজনৈতিক প্রায় সকল কৌম বা সম্প্রদায়ের বিদ্রোহেই এ ঘটনা দেখা যাবে।

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক কর্তৃত্বের ছত্রচ্ছায়ায় বাঙালি সামন্ত-অভিজাতের বিরুদ্ধে সাঁওতালি বিদ্রোহ সামন্তপ্রভু-মহাজন ও বেনিয়াবিরোধী আদল গ্রহণ করেছিল, অন্যদিকে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালিত হয়েছিল পাকিস্তানের বড় বুর্জোয়া এবং সামরিক-বেসামরিক আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে।

এখানে এসে প্রাক-রাজনৈতিক প্রত্যয়টি বোধ হয় ব্যাখ্যা করা দরকার। পয়লায় বলতে চাই যুগ বিভাজনের কথা। ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে নানান বৈশিষ্ট্যে চিহ্নিত। এর মধ্যে একেকটি যুগকে তার প্রধান সমাজ-অর্থনৈতিক রূপ ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের বেণিবন্ধনে বাঁধা একগুচ্ছ সম্পর্ক ও ধারণার মধ্যে জীবন বয়ে চলে তার প্রাধান্য স্বীকার করে চিহ্নিত করাই নিরাপদ। এর ভিত্তিতেই আমরা কোনো যুগকে সামন্তীয় আবার কোনো যুগকে পুঁজিবাদী বলে নাম দিই। এখন ভারতে যখন একদিকে ব্রিটিশ বেনিয়া পুঁজি সনাতন সামন্ত প্রথার সঙ্গে কার্যকর আঁতাতের মাধ্যমে রাজত্ব করছে, তখনো বিশাল ভূভাগের নানান আনাচকানাচে টিকে আছে নানান জনজাতির কৌমসমাজ। কিন্তু এদের সকলের ওপর কায়েম আছে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র। যে রাষ্ট্রটি তার আগের মোগল রাষ্ট্র থেকে মৌলিকভাবেই পৃথক ও আধুনিক। আধুনিক রাষ্ট্রের কেন্দ্রে বসে থাকে পুঁজি ও তার মালিক বুর্জোয়া। এরা নিজ দেশে এবং তাদের উপনিবেশিত অঞ্চলে যে ধারারই সমাজ-অর্থনীতি চালু করুক না কেন, গড়ন ও আত্মার দিক থেকে তা কমপক্ষে অসনাতনী এবং সেই অর্থেই আধুনিক। এই আধুনিক রাষ্ট্রে রাষ্ট্র ও জনগণের মধ্যকার সম্পর্ক কোনো ধর্মীয় মহিমা বা রাজা-প্রজার অলঙ্ঘনীয় পবিত্রতার কঠোর পর্দা দিয়ে ঘেরা নয়। এই নতুন রাজ্যে রাষ্ট্র সম্পর্কিত বিষয়-আশয়ের নাম রাজনীতি, এখানে দেশ চালায় সরকার।

মহারানি বলে একজন থাকছেন বটে, কিন্তু নিছক গুণকীর্তন ছাড়া আর কোনো বিশেষ প্রাপ্য তার জন্য বরাদ্দ নেই। এ রাষ্ট্র কঠোররূপে স্বৈরতান্ত্রিক হলেও শাসনের স্বার্থে আবেদন-নিবেদনের একটা খাত সে শাসনকেন্দ্র থেকে নাগরিক ও করদ অভিজাতদের অবস্থান বরাবর কেটে রেখেছে। এ খাতের খাতক সে সময়ের নাগরিক মর্যাদাবান যাঁরা, সেই জমিদারকুলের লোকজন, ইংরেজের সওদাগরি ব্যবসার কেরানি এবং পেনশনভোগী প্রাক্তন রাজন্যবংশের পরজীবীরা। পরে আমরা দেখব, এই সরুখাতটি পয়লায় খাল ও পরে নদী হয়ে শাসনকেন্দ্রের চারপাশের লোকজন, বুদ্ধিজীবী থেকে শুরু করে মায় চার আনা খাজনার মাঝারি চাষিকে পর্যন্ত গ্রাস করেছে। রাষ্ট্র এভাবে নাগরিকত্বের সনদ দিয়ে বিরোধিতাকে আইনি খাতে চলবার কবালা করে নেয়। সুতরাং রাষ্ট্র যে হারে রাষ্ট্র হয়ে ওঠে, সেই হারে সে নাগরিকত্ব বিলায়। অন্যদিকে জনগণের বিপুল রাশি থেকে যে হারে নাগরিক গজায়, সেই হারে দেশের ওপর রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা কায়েম হয়। এই নাগরিকরা রাষ্ট্রের কাছে দৃশ্যত ব্যক্তি বলে শনাক্ত হয়।

যতক্ষণ না ওই ব্যক্তিরা কোনো সভা-সমিতি-অ্যাসোসিয়েশন বা লাইসেন্সপ্রাপ্ত আনুষ্ঠানিক রাজনৈতিক দল গঠন করে, ততক্ষণ রাষ্ট্রের চোখে তারা একক ব্যক্তি। আইনের চোখেও সাধারণত তারা এমন পরিমাপই পেয়ে থাকে। এভাবে নাগরিক সমাজ ওরফে সিভিল সমাজ সৃজনের মাধ্যমে একটা আস্ত রাজনৈতিক পাটাতনের পত্তন হলেই কেবল রাজনীতির জন্ম হয়। জন্ম হয় আধুনিক আইন ও অর্থনীতির। এ আইনের আশ্রয় ও অর্থনীতির বিশেষ স্নেহ পেয়ে নাগরিক সমাজ নিতান্তই বশ্যতাপ্রিয় হয়। ব্রিটিশ সামরিক দাপট এবার আইন ও অর্থনীতির তাগিদে নিজের বৈধতা আদায় করে আধিপত্য বিস্তারে সফলকাম হবার সুযোগ পায়। রাজনীতি ও অর্থনীতি এই বশ্যতার আয়োজনেরই আনুষ্ঠানিক কর্মকাণ্ড মাত্র।

এ রাজনীতি নাড়ি গিট্টুতে বাঁধা থাকে রাষ্ট্রের শাসকদের অর্থনৈতিক তৎপরতার সঙ্গে। ঔপনিবেশিক পুঁজি তার চালক হলে রাজনীতি সেই গড়নই পায়, যা ঐ পুঁজির জন্য পুষ্টিদায়ক।

কোম্পানির শাসনে কলকাতায় খুঁটি পোঁতা ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র তখনো ঠিক করে উঠতে পারেনি, কী হবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পূর্ব দিগন্তের নয়া দখলদারিত্বের আকার-অবয়ব। তখনো অনেক এলাকা তার শাসনের বাইরে থেকে গিয়েছিল, অনেক ক্ষমতা তখনো দেশীয় খুদে প্রভুদের হাতে জমা ছিল।

এই যখন অবস্থা, তখন ধরেই নেওয়া চলে, কলকাতা থেকে দূরের সাঁওতাল পরগনায়, উপমহাদেশের প্রথম রাজনৈতিক দল কংগ্রেসের জন্মের ঠিক তিরিশ বছর আগে ১৮৫৫ সালে কোনো রাজনৈতিক বিধিবিধান বিরাজ করা সম্ভব ছিল না। এই অসম্ভাব্যতা দুই বিচারে। ব্রিটিশ পুঁজি ও রাষ্টের পরিধি বিস্তার না হওয়ার কথা আগেই বলা হয়েছে। অন্যটি হলো সাঁওতাল সমাজের ঐতিহাসিক প্রকৃতি। সাঁওতাল সমাজে তখনো ব্যক্তিমালিকানা বিকশিত না হবার কারণে ব্যক্তির আলাদা পরিচয় ও ক্ষমতা নির্ণিত হবার অবস্থা তৈরি হয়নি। তাদের জীবন কৌমজীবন, তাদের স্বার্থবোধও সম্প্রদায়ের একীভূত স্বার্থের খুঁটিতে ভর করা। ফলে ব্যক্তির অনুপস্থিতি এবং পুঁজিবাদী সম্পর্কের বাইরে থাকবার কারণে তাদের ভেতরে রাজনৈতিক আচার-ব্যবহারের প্রচলন ঘটতে পারে না। তার দরকারই হয় না।

আধুনিক বিশ্লেষকের চোখে তাদের জীবনের এই নির্জনতাই আদিম বলে ধরা পড়ে। আবার নিজেদের মধ্যে মৌলিক কোনো বৈরী বিরোধ না থাকায় তাদের ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগত স্বার্থ চরিতার্থের জন্য রাজনীতির দরকার হয় না। গোষ্ঠীগত স্বার্থ আদায়ে নতুন উদিত মধ্যবিত্তের মতো কৃত্রিম কায়দায় সংগঠন বা দল গড়াও তাদের জন্য অবান্তর। তাদের যা ভালোভাবেই আছে– সেই ঐক্য, তার জন্য আবার আলাদা করে চেষ্টা কেন? এটা তাদেরই চাই, যে সমাজে মানুষ পরস্পরবিরোধী স্বার্থের কারণে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন। আবার স্বার্থই তাদের প্রতিযোগিতামূলক নানান অর্থনৈতিক ও সামাজিক সংগঠনে জমায়েত করে। স্বার্থ আরো বিপন্ন হলে তবে তারা অধিকতর প্রতিযোগিতামূলক সংস্থা হিসেবে, পারস্পরিক রেষারেষির মীমাংসা সাধনে দল গড়ে?।

এভাবে বিচ্ছিন্নতা থেকে যে রাজনীতির জন্ম হয়, সাঁওতালি মানুষ তার পরিধির ওপারে–হেগেলীয় বিশ্ব-ইতিহাসের ওপারে বসবাস করে। তাদের বিদ্রোহ তাই প্রতিষ্ঠিত-চালু রাজনীতির বাইরের ঘটনা। যে কারণে তারা অধিপতি চিন্তাকাঠামোয় 'প্রাগৈতিহাসিক', সে কারণেই তাদের সশস্ত্র (জঙ্গি?) বিদ্রোহ 'অরাজনৈতিক'! আবার সেটাই তাদের ওই বিশ্ব-ইতিহাসে প্রবেশ এবং রাজনীতিরও সূচনাবিন্দু। বিদ্রোহ তাই রূপান্তরের মাহেন্দ্রক্ষণ, পরিবর্তনের শিখরস্থান। বিদ্রোহ সকল কিছু কমবেশি পাল্টায়, তবে সবচেয়ে বেশি পাল্টায় বিদ্রোহী নিজে। সে তখন হয়ে ওঠে ইতিহাসের কারিকাশক্তি। আবার তখন থেকে ইতিহাসও আরো নিজের করে তাকে তুলে নেয়। কিন্তু জাতিরাষ্ট্র, আধিপত্যমূলক রাষ্ট্র তাদের সেই স্বীকৃতি দিতে অপারগ। কেননা কমিউনিটি যদি প্রজা বা নাগরিকে নিজেকে সীমিত না করে, তাহলে রাষ্ট্র তাদের জীবনে নিজের সার্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে না, পারে না আইনের প্রতিষ্ঠা করতে তাদের অন্তরে।

সাঁওতালরা এদেশে সেই জনগোষ্ঠী, যারা অরণ্য-পাহাড়ময় প্রকৃতির ভেতর নিজেদের শ্রমের মধ্য দিয়ে নতুন বসতি ও আবাদ তৈরি করেছিল। এ পথেই জমি-অরণ্য ও জাতভাইদের সঙ্গে গড়ে উঠেছিল কৌম সম্পর্ক। বর্ণহিন্দু জোতদার-বেনিয়া ও মহাজনদের কাছে এদের ফসল লুট করা, এদের ঋণের ফাঁদে ফেলা তাদের কাছে ন্যায্যতা পেয়েছিল। আর তাই এটা নিরেট অর্থনৈতিক শোষণ নয়। কারণ তারা যে শুধু জমির ওপর কর আকারেই ফসলের ভাগ দাবি করত তাই নয়, বড় শোষণটা চলতো সোজাসুজি লুণ্ঠনে। এর বৈধতাটা আসত সাঁওতালদের থেকে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্বের দাবি মারফত। সেদিন এ রকম সরাসরি শত্রুতার সম্পর্ক যাদের ছিল, তারা কারা ছিল? তারা ছিল সেই প্রজাদেরই অংশ, আনুগত্যসূত্রে রাষ্ট্র যাদের পক্ষাবলম্বনের জন্য দায়বদ্ধ। সেই বাঙালি দিকুদের বর্ণনায় তাই বিদ্রোহ ধরা পড়ে অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের চূড়ান্ত রূপ হিসেবে। যে কাজগুলো তারা এতকাল করে এসেছে– সেই হয়রানি, হত্যা, ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া, সম্পত্তি ধ্বংস করার উপায়ে এতকাল যে আধিপত্য ও দাপট তারা চালাতে পেরেছে, বিদ্রোহী সাঁওতালরা সেই ক্ষমতা ও দাপটকেই রুখে দাঁড়ায়। কিন্তু এই রুখে দাঁড়ানো সাধারণ প্রতিবাদ থেকে বিদ্রোহের পর্যায়ে পৌঁছে তখনই, যখন আধিপত্যের ওইসব কার্যকলাপকে তারা তার উৎসের দিকেই ঘুরিয়ে দেয়–অর্থাৎ জমিদার-মহাজন ও পুলিশের বিরুদ্ধে। তাদের ধ্বংসমূলক কার্যকলাপ সেই ক্ষমতারই সমান দাপটের ঘোষণা। মোটকথা, বিদ্রোহের মুহূর্তে বিদ্রোহী ক্ষমতাকে অস্বীকার করে নিজেই পাল্টা-ক্ষমতা হয়ে ওঠে। বিদ্রোহীর এই ক্ষমতা অর্জন প্রভুত্বকারীর চোখে এক ধরনের দুষ্কৃতি এবং পাপকর্ম। সে কারণেই মধ্যযুগের ব্রিটেনে কৃষি থেকে উচ্ছেদ হওয়া চাষিরা দলবদ্ধভাবে পাল্টা-আঘাত করলে রাষ্ট্রের কাছে তার ভূমিকা হয় ডাকাতের।

বিদ্রোহ তাই রূপান্তরের মাহেন্দ্রক্ষণ, পরিবর্তনের শিখরস্থান। বিদ্রোহ সকল কিছু কমবেশি পাল্টায়, তবে সবচেয়ে বেশি পাল্টায় বিদ্রোহী নিজে। সে তখন হয়ে ওঠে ইতিহাসের কারিকাশক্তি। আবার তখন থেকে ইতিহাসও আরো নিজের করে তাকে তুলে নেয়।

কার্ল মার্কস্ তাঁর 'পুঁজির উদ্ভব' পুস্তিকায় হাজির করেছেন এ রকম নিঃস্ব হওয়া 'কৃষক ডাকুদের' প্রতিরোধের কথা। রবিনহুডের কথা তো সকলেই জানে। বিদ্রোহ তাই সকল সময় শাসক ও সম্পত্তিমানের চোখে লুটপাট ও ক্রিমিনাল কার্যকলাপ। যার বিহিত একমাত্র ফৌজদারি ব্যবস্থা অর্থাৎ দমন ও শাস্তির পথেই হতে পারে বলে তাদের বিশ্বাস। কলকাতার সংবাদ প্রভাকর পত্রিকায় তাই ছাপা হয়: *'অরঙ্গাবাদ, ১১ জুলাই ১৮৫৫। অদ্যকার সংবাদ অতি ভয়ানক, রাজবিদ্রোহীগণ অরঙ্গাবাদের পশ্চিম ৫/৬ ক্রোশ ব্যবধানের মধ্যে আসিয়া গোঁদাইপুর, শাহবাজপুর, কালিকাপুর, ঝিকড়হাটি, নসরতপুর ইত্যাদি গ্রাম সকল লুটপাট করিতেছে, প্রজাদিগের যথাসর্বস্ব অপহরণপূর্ব্বক দগ্ধ করিতেছে, অনেকের প্রাণসংহার করিয়াছে। এইরূপ অত্যাচার কুত্রাপি হয় নাই, আমড়ার মহারাজের জামাতা শ্রীযুত গোপীনাথ পাঁড়ে মহাশয় রাজধানী হইতে ঝিকড়হাটি নামক গ্রামে অবস্থান করিতেছিলেন, দুরাত্মারা তথায় তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া গুরুতররূপে আঘাতি করিয়াছে এবং বহু অর্থ ও*

দ্রব্যাদি লুট করিয়া লইয়াছে, রাজজামাতা অতি সম্ভ্রান্ত ধনাঢ্য লোক, তাঁহার যখন এইরূপ অবস্থা হইয়াছে তখন প্রজার দুঃখ বিবরণ কী বর্ণনা করিব! এই বিষয়ে লিখিতে কাষ্ঠের লেখনী ক্রন্দন করিতেছে।' (পশ্চিমবঙ্গ, সাঁওতাল বিদ্রোহ সংখ্যা পৃ. ৩১)

যিনি বিবরণ দিয়েছেন, সন্দেহ নেই তিনি সাঁওতাল বিদ্রোহীদের হাতে 'নিপীড়িত' প্রজাদেরই একজন এবং এও সন্দেহ নেই যে, 'রাজজামাতা অতি সম্ভ্রান্ত ধনাঢ্য' প্রজানিপীড়ক। 'প্রজা' এবং 'রাজজামাতা' উভয়েই যে অবস্থাপন্ন তার প্রমাণও 'কাষ্ঠের লেখনীর ক্রন্দন' ভেদ করেও পাওয়া যায়। এই বর্ণনার সত্য-মিথ্যা নির্ণয় করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু যখন একই কর্ম তারা সাঁওতালসহ বাঙালি কৃষকদের ওপর যুগ যুগ ধরে করে আসতে থাকে, সেই হত্যা, লুণ্ঠন, ধর্ষণ, উচ্ছেদ ও আগুন লাগানো; তখন তা হয়ে যায় শাসন। বিদ্রোহ দমনে শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য সংবাদ প্রভাকর পত্রিকা বারবার আবেদন করেছিল। এমনকি তারা এত দূরও বলেছিল যে, দেশ থেকে কি ইংরেজের শাসন উঠে গেছে? প্রতিটি বিদ্রোহেই কায়েমি ক্ষমতা বিদ্রোহীর কার্যকলাপকে এই ভাষাতেই বর্ণনা করে। তাদের এই 'লুটপাট', 'প্রাণসংহার', 'দুরাত্মা' প্রভৃতি শব্দ ব্যবহারের মধ্যে তাদের সেই উচ্চ অবস্থানেরই ছাপ লেগে আছে।

বিদ্রোহের প্রথম কথা হচ্ছে, তা অভূতপূর্ব ও সৃষ্টিশীল। বিদ্রোহের মুহূর্তে নিজেদেরকেও তারা নতুন করে সৃষ্টি করছিল। তাদের সেই চম্পা দেশের গল্প, যেখানে আদিতে তারা ছিল। সেটা তাদের সামনে একটা বড় অনুপ্রেরণা হয়ে ছিল। ইংরেজরা বলছে যে, এ জাতি প্রচণ্ড স্বাধীনচেতা, আর সমস্ত কিছুর পরেও তাদের এই আকাঙ্ক্ষা তাদের লড়াইয়ের স্পৃহা জুগিয়েছিল। এখন এই স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা কি কোনো আলংকারিক জিনিস? স্বাধীনতা চাই, সে কারণেই আমি মরতে চাই– বিষয়টা তো এ রকম কোনো ব্যাপার নয়। বা স্বাধীনতা প্রত্যয়টিও কোনো বিমূর্ত গুণ নয়, যার জন্য কেউ মরতে পারে; বরং এভাবে দেখা যেতে পারে, স্বাধীনতা হচ্ছে সেই জিনিস, নিজের জীবন, নিজের ভূমি ও নিজের ইতিহাসের ওপর নিজের কর্তৃত্ব স্থাপন করা। এবং সেই কর্তৃত্বের বিরোধী শক্তিকে রুখে দাঁড়াবার চেষ্টা করা। সে কারণে তাদের স্বাধীনতার সংজ্ঞার মধ্যে শুধু ভূমির অধিকারের প্রশ্নই আসছে না, থাকছে আত্মমর্যাদার বোধ। ব্রিটিশ গেজেটিয়ারগুলোতে উল্লেখ করা হচ্ছে, নারীদের ওপর আক্রমণকে সাঁওতালরা বিশেষ চোখে দেখত। সে সময় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের নেটওয়ার্ক রেললাইন বিস্তারের কাজ চলছিল তাদের বনের ওপর দিয়ে, তাদের গ্রামের ওপর দিয়ে। সাঁওতালদের বাধ্য করা হচ্ছিল সেই কাজে বেগার খাটতে এবং বেশ কটি ঘটনা পাওয়া যাচ্ছিল, যেখানে ইঞ্জিনিয়াররা সাঁওতাল নারীদের তুলে নিয়ে যাচ্ছিল। এ রকম অনেকগুলো ঘটনা পাওয়া যাবে, যা বিদ্রোহের জন্য চরম পরিস্থিতি সৃষ্টি করছিল এবং ধরা পড়ে যে, একটা বিদ্রোহ ঘটছে।

এই বিদ্রোহ অন্য পন্থা নিচ্ছে না। সিপাহি বিদ্রোহের সাথে তুলনা করলে, যেমন সিপাহি বিদ্রোহে দেখা যাবে, সেটা একটা সর্বভারতীয় চেহারা পাচ্ছে। তারা যুদ্ধ করছে এবং তার ফলে একটা সত্যিকার পরিবর্তন হবে। রাজ বদল হবে, কোম্পানির জায়গায় বাহাদুর শাহ বাদশাহ ক্ষমতা পাবে। সার্বভৌমত্বকে তারা বাদশাহি ক্ষমতার চেহারা দিয়েছিল। এ বিদ্রোহে যে পন্থাগুলো গৃহীত হয়েছিল, দেখা যাবে তার সাথে ব্রিটিশের পন্থার মিল আছে। একটা সংগঠিত বাহিনী আরেকটা সংগঠিত বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করছে। আর এখানে আমরা দেখব, বাঙালি আর ইংরেজের স্বার্থগত রাজনৈতিক জোট আর তার সশস্ত্র ক্ষমতার বিরুদ্ধে লড়াই করছে পুরো জাতি। জাতির প্রতিটি সদস্য সশস্ত্রভাবে রুখে দাঁড়াচ্ছে। রুখে দাঁড়াচ্ছে সমস্ত শক্তিকে জড়ো করে।

জাদুবিশ্বাসের আশ্রয়ে পালিত তার ইতিহাস, তার ঐতিহ্য–সবকিছুই সামনে চলে আসছে। তার বিশ্বাস যে, তাদের তীরের সামনে বন্দুকের গুলি পানির মতো গলে যাবে। তার ঐক্যের সামনে রেললাইন থেমে যাবে। তার ঠাকুরের নির্দেশে কোনো কিছুই তাদেরকে প্রতিহত করতে পারবে না। একে আমরা সহজেই কুসংস্কার হিসেবে নিতে পারি, যদিও ইতিহাসে এরও ভূমিকা আছে। এভাবে বললে একটা সোজা হিসাব হয়ে যায়, কিন্তু এত সোজা করে তো আর করা যায় না, কারণ যখন বারবার তা ঘটে, প্রতিটি কৃষক বিদ্রোহেই এই ধরনের বিশ্বাস ও জাদুগাথা যখন একটা সক্রিয় ও শক্তিশালী উপাদান হয়ে কাজ করে, তখন মনে করতে হয় তা কল্পগাথা হলেও, কল্পিত রূপে হলেও তার মধ্যে এমন একটা শক্তি রয়েছে, যা আসলে বস্তুগত বাস্তবতার আকারে কাজ করে।

প্রতিটি কৃষক বিদ্রোহেই এই ধরনের বিশ্বাস ও জাদুগাথা যখন একটা সক্রিয় ও শক্তিশালী উপাদান হয়ে কাজ করে, তখন মনে করতে হয় তা কল্পগাথা হলেও, কল্পিত রূপে হলেও তার মধ্যে এমন একটা শক্তি রয়েছে, যা আসলে বস্তুগত বাস্তবতার আকারে কাজ করে।

ঔপনিবেশিক ভারতের কৃষক বিদ্রোহের ইতিহাস পর্যালোচনা করতে গিয়ে রণজিৎ গুহ ছয়টা বৈশিষ্ট্যের কথা বলছেন। একটা হচ্ছে বিদ্রোহের মধ্যকার অস্বীকার করার প্রবণতা– যাকে তিনি নেগেশন বলছেন। এরপর আসছে দ্ব্যর্থবোধকতা বা অ্যামবিগুইটির কথা, যার মধ্যে নিজেকে শত্রুর কাছে অস্পষ্ট করে তোলা এবং তার মধ্য দিয়ে বিপরীত অর্থ তৈরি করা। বিদ্রোহের খবর শুনে ইংরেজ এক সায়েবকে পাঠায় কথা বলার জন্য। সাথে তার পুত্র। এদিকে সাঁওতালরা রওনা দিয়েছে কলকাতার দিকে, সেখানে তারা বিচার প্রার্থনা করবে। পথিমধ্যে উভয় পক্ষের দেখা হয়। কিন্তু সিধুর দ্ব্যর্থবোধক কথার উত্তর ভুল করায় সাঁওতালরা ভাবে, সায়েব তাদের ধরতে আসছে। ফলে তাকে নিহত হতে হয়। তিনি বলছেন মোডালিটি বা বিশেষ ধরনের ক্রিয়াকর্মের ধরন, যে ক্রিয়াকর্ম তার উদ্দেশ্য ও চৈতন্যের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। তিনি বলছেন সঞ্চার বা ট্রান্সমিশনের কথা, যেখানে নিজস্ব পন্থায় নিজ জনগোষ্ঠীকে ঐক্যবদ্ধ করায় প্রচার চলে, তার যে নির্দেশ দ্রুত তা পৌঁছে দেওয়ার মেকানিজম। তিনি বলছেন আঞ্চলিকতার কথা। তেভাগার সময় রংপুরের কৃষকরা এলাকার জমিদারদের তাড়িয়ে দেওয়ার পর রংপুরকে স্বাধীন করার ধ্বনি তুলেছিল। রংপুরই ছিল তাদের দেশের সীমানা। সিপাহি বিদ্রোহের সাথে এখানেই তার তফাত। সাঁওতাল বিদ্রোহ সিপাহি বিদ্রোহের থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিজ জাতির ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক ও ঐতিহ্যিক যে অঞ্চল

বিদ্রোহের সীমা, তার মধ্যেই অঙ্কিত। সেক্ষেত্রে চম্পা দেশের স্বাধীন অস্তিত্ব তার বর্তমান পরাধীনতাকে মেনে না নিতে উৎসাহী করে তোলে।

বিদ্রোহী চৈতন্যের এই যে গড়ন, এই গড়নের দিকে আমাদের মনোযোগ নিবদ্ধ করতে হবে। তা যদি করি তবে একটি স্বতন্ত্র ঐতিহাসিক ধারা হিসেবে আমরা তাকে দেখতে পাব। এবং তার মানে এই নয় যে, বিদ্রোহী চৈতন্য কোনো কাল্পনিক অবস্থা, যার মধ্যে বাস্তব জীবনের শোষণ-বৈষম্যের প্রতিফলন বা সরাসরি উপস্থিতি নেই। বরং বলতে হবে, এটা এমন একটি অবস্থা, তার যে দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা, নিজের ও জাতি সম্পর্কে তার যে ঐতিহাসিক বাসনা– এই দুয়ের সম্মিলনেই বিদ্রোহী চৈতন্যের রসদ তৈরি হয়। বিদ্রোহী চৈতন্য নির্মিত হওয়ার এই প্রক্রিয়ার বাস্তব সূত্র আমরা কোথা থেকে পাব? আবার অনেক সময় হয়তো এই সূত্রগুলো ধরা পড়ছে না বলে বলা হচ্ছে, এটা কুসংস্কার এবং কুসংস্কারই তাদেরকে চালিত করছে। ইংরেজ পণ্ডিতরা ব্যাখ্যা করতে পারে না বা বাঙালি পণ্ডিতরা বুঝতে পারছে না কেন বিদ্রোহের সময় যতক্ষণ তাদের নাগড়া, তাদের ঢোল বেজে যাচ্ছে, ততক্ষণ শেষ লোকটি পর্যন্ত লড়ে যাচ্ছে?

এ রকম অনেক উদাহরণ আছে, যেখানে একটি স্থানেই তীর আর বন্দুকের অসম লড়াইয়ে হাজার হাজার সাঁওতাল মারা যাচ্ছে। নিশ্চিত মৃত্যু জানার পরেও তারা ফিরে যাচ্ছে না এবং তাদের ফিরে যাওয়ার কোনো উপায় নেই এবং তারা যাচ্ছে না। একে শুধুমাত্র বোকামি বা দুঃসাহস বলে ব্যাখ্যা করার চেয়ে সেই চূড়ান্ত রকম অস্বীকার করার প্রবণতা বলে শনাক্ত করতে হবে। দেখা যাবে যে, আগের দিন যে লোকটা ছিল সবচেয়ে সাধু, সবচেয়ে নমনীয়, পরের দিন বিদ্রোহের মুহূর্তে সেই লোকটাই, তাদের ভাষায় আক্রমণাত্মক ভঙ্গি গ্রহণ করছে। সাঁওতালদের সম্পর্কে ইংরেজদের যে ভাষ্য– তারা শান্ত, নিরীহ, তারা মিথ্যা বলতে পারে না– এ রকম যাবতীয় রকম সরল গুণাবলিতে তাদের চিত্রিত করা হয়। কিন্তু বিদ্রোহের মুহূর্তে তারা এমন এমন কর্ম করছে– তারা মানুষ হত্যা করছে, বাড়ি জ্বালিয়ে দিচ্ছে, তাদের এলাকায় শত্রুর শেষ নিশানা পর্যন্ত তারা ধাওয়া করছে।

তাদের পয়লা শত্রু ছিল বাঙালি দিক–বাঙালি মহাজন, যারা সেখানে ঋণ দেওয়া, দাদন দেওয়ার কারবার করত, যারা তাদের ফসল পাচার করত। তাদের বিরুদ্ধে লড়াই অতি দ্রুত চলে যাচ্ছে পুলিশের বিরুদ্ধে, এমনকি ইংরেজ পর্যন্ত। এই যে বিদ্রোহের সীমানা প্রসারিত হচ্ছে, তা একই সাথে দুই দিকেই হচ্ছে। একদিকে শত্রুর নিশানায় ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র পর্যন্ত চলে আসছে, আঘাতপ্রাপ্ত হচ্ছে; অন্যদিকে মিত্রের তালিকায় শুধু সাঁওতাল নয়, ডোম, তাঁতি, চামার, কামার নিম্নবর্গের মুসলমান পর্যন্ত একাকার হয়ে যাচ্ছে, আমরা দেখব যে, দুটি সারি মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যাচ্ছে, যাদের মধ্যে আর কোনো চলাচল, আর কোনো যোগাযোগ নেই। এমনকি কেউ কাউকে বুঝতে পারার অবস্থায় পর্যন্ত নেই। সে কারণে বিদ্রোহী চৈতন্য আসলে এক ধরনের অ্যাবসলিউট, যে রকম অ্যাবসলিউট আধিপত্যের চৈতন্য। এবং সেই আধিপত্য বিদ্রোহীর এই অস্বীকার করার প্রবণতা, তার না-বাচকতা আসলে অধিপতি সভ্যতারই উল্টানো একটা রূপ– তার বিপরীত।

রণজিৎ গুহ মার্কসের একটা উপমায় একে ব্যাখ্যা করছেন, মার্কস বলছেন যে, একজন যখন নতুন ভাষা শেখে, তখন সেই ভাষায় কিছু বলবার আগে নিজের ভাষায় তা অনুবাদ করে নেয়। ব্যাপারটা এ রকম, তারা যখন বিদ্রোহে যাচ্ছে, তারা যখন রুখে দাঁড়াচ্ছে, তখন শত্রুর যে ভাষা, সেটাকে তাদের মতো করে রপ্ত করে এবং সেটাকে আবার ফিরিয়ে দেয় শত্রুরই বিরুদ্ধে। ফলে এই বিদ্রোহ সে সময়ের কলকাতাকেন্দ্রিক পত্র-পত্রিকায় যে পরিমাণ নিন্দা অর্জন করেছিল বা পরের বিদ্রোহগুলো– যেমন বিরসা মুণ্ডার বিদ্রোহে কিংবা সমগ্র ঔপনিবেশিক আমলে যে বিদ্রোহ হয়েছিল, দেখা যাচ্ছে যে, পুরো ১১৭ বছরে বিদ্রোহ হয়েছে ১১১টি। এবং সবগুলোই কৃষক বিদ্রোহ। এগুলো নিশ্চয়ই বড়মাপের বিদ্রোহ, ছোটগুলো ধর্তব্যে আসেনি। পুরো কালপর্যায় জুড়ে তাহলে দেখা যাচ্ছে, ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র, তার স্বার্থ, তার আদর্শ , তার সংস্কৃতি ইত্যাদির বিরুদ্ধে যদি কোনো ধারাবাহিক একক কোনো ধারা দেখি, তাকে দেখতে পাব কৃষক বিদ্রোহীদের মধ্যে। সেই অর্থে সাঁওতাল বিদ্রোহ এই ধারারই অন্যতম দৃষ্টান্ত।

তাহলে প্রশ্ন আসে, যদি আমরা এটাকে কৃষক বিদ্রোহ বলি, তাহলে সাঁওতাল জাতির জাতীয় বিদ্রোহ হিসেবে অন্য কৃষক বিদ্রোহের সাথে এর তফাত কী? যেমন বলা যেতে পারে, তার সাথে তীতুমীরের বিদ্রোহের তফাত কী, পাবনার কৃষক বিদ্রোহের তফাতই বা কী? যেমন বলা যেতে পারে, তার সাথে তীতুমীরের বিদ্রোহের (১৮৩০-৩১ সাল), পাবনার কৃষক বিদ্রোহের (১৮৭৩ সাল) বৈশিষ্ট্যগত ভিন্নতা কী? এই প্রশ্নের সঙ্গে জড়িত প্রশ্ন হলো: বিদ্রোহী, স্বাধীনতাকামী, বিপ্লবী, ধর্মযোদ্ধা যা-ই বলি; তাদের স্বরূপ কি তাদের নিজস্ব চেতনার বিশ্লেষণ ছাড়া অনুমানও করা সম্ভব? প্রতিরোধের অর্থনৈতিক কার্যকারণের পাশাপাশি সাংস্কৃতিক প্রেরণা হিসেবে যেসকল চেতনারাশির কথা আসে, যেমন স্বাধীনতা, মর্যাদা, নৈতিকতা, অধিকার, সাম্যতৃষ্ণা ইত্যাদি; সেসব কি পরের কালের ইতিহাস ও রাজনীতির প্রকল্পের আরোপন নয়?

পরিশিষ্ট:

ঐতিহাসিক আলোড়নের ঘটনার চরিত্র বিচারের এই প্রশ্ন ঘিরে তত্ত্বায়ন ও বিশ্লেষণের কাজ ইতিহাসবিদরা করে যাচ্ছেন, রাজনীতির কর্মীদেরও সেই তাড়না একারণেই থাকা দরকার। নতুবা যার যার রাজনৈতিক ও মতাদর্শিক প্রকল্পে জনগণের বিভিন্ন অংশের লড়াই-সংগ্রাম ব্যবহৃতই হবে, সেগুলো থেকে রাজনৈতিক কর্মসূচি এবং মতাদর্শিক দিকদিশা নিঃসৃত করে নিয়ে আসা সম্ভব হবে না।

ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে থেকে শুরু করে হালের রণজিৎ গুহ পর্যন্ত, সকলেই যেই জ্ঞানচর্চার জগতে সক্রিয় তাকে ইতিহাসশাস্ত্র বলা হয়। সাঁওতাল জাতির বাস্কে অথবা বাঙালি জাতির গুহ ইতিহাসবিদ হিসাবে স্ব স্ব কালের বিবিধ ইতিহাস-চেতনার অংশ। কোনো না কোনোরকম ইতিহাস-প্রকল্পের পক্ষপাত বা বিপক্ষতা তাঁদের তাড়িত করে থাকতে পারে।

ফারুক ওয়াসিফ: লেখক, সাংবাদিক
ইমেইল:bagharu@gmail.com